The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIX (Issue 2), 2023 (pp.1 -14)
Published in December, 2025

বৈশ্বিক পরিবেশগত সংকট উত্তরণে পরিবেশ নীতিবিদ্যা শিক্ষার গুরুত্ব

ড. মোঃ কোরবান আলী*

প্রতিপাদ্যসার: আজ পরিবেশগত সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছেছে। মানুষের দ্বারা দিনে দিনে ধ্বংস হওয়া প্রকৃতি এবং দূষিত পৃথিবী এই বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে চলেছে। এই নেতিবাচক চিত্র সৃষ্টির জন্য মানুষই দায়ী। যাইহোক, মানুষ অন্য সব প্রাণীর মতো বেঁচে থাকার জন্য তাদের পরিবেশের উপর নির্ভরশীল এবং নিজের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যার বিরুদ্ধেও অসহায়। পরিবেশগত সমস্যা প্রতিরোধের জন্য বিদ্যমান প্রতিরোধমূলক আইন এবং জরিমানাও অপর্যাপ্ত। কাজেই অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে অধিকতর সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবেশগত নৈতিকতা শিক্ষা তাদের পথ দেখাতে সক্ষম হবে। মানবজাতি, পরিবেশগত নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে আরও সচেতন হয়ে পরিবেশের সাথে তাদের সম্পর্ককে আরও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে পারে। প্রকৃতির অখন্ডতা রক্ষার জন্য, স্থায়িত্বের জন্য, মানুষকে শিখতে হবে কীভাবে অন্যান্য প্রাণীসহ বাস্তুতন্ত্রের সকল সদস্যের প্রতি নৈতিকভাবে আচরণ করতে হয়। আমাদের আচার-আচরণে পরিবেশের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পেতে হবে। পরিবেশ সংকটকে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব নয়, সমন্বিতভাবে আমাদের তা করতে হবে। দার্শনিক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের থাকতে হবে। বর্তমান পরিবেশ সংকট নিষ্পত্তি করতে হলে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাঝেও নৈতিকতাকে সমানভাবে স্থান দিতে হবে। নীতিবিদ্যা আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আমাদের মাঝে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উপলব্ধি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পরিবেশগত সংকট যা বিশ্বব্যাপী আঘাত হেনেছে এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎকে হুমকির মুখে ফেলেছে সেটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্থানীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রশমনের দাবি রাখে। কাজেই এই প্রবন্ধে, পরিবেশগত নৈতিকতা বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রেক্ষাপটে মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবেশভিত্তিক জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশগত নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধ ইঙ্গিত করে যে পরিবেশগত শিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষা মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতাকে বিকশিত করবে। যখন মানুষের পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকে এবং এই জ্ঞানটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলিত হয়, তখন এটি পরিবেশের প্রতি ইতিবাচক আচরণে রূপান্তরিত হতে পারে।]

১. ভূমিকা

আজ আমাদের পুরানো পৃথিবীতে অনেক পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে যেমন দূষণ, মরুকরণ, বন উজাড়, মাটির ক্ষয়, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, ওজোন স্তরের ক্ষয়, জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষতি, গ্রিণহাউস প্রভাব, অ্যাসিড বৃষ্টি, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলি সমস্ত জীবের ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে উঠেছে। এই হুমকির জন্য মানুষই দায়ী। প্রকৃতির প্রতি মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপ এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণই এই বিপর্যয়ের আসল কারণ। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার দিয়ে আমরা

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

উপকৃত হয়েছি। তারও পূর্বে যখন শিল্প বিপ্লবের যুগের সূচনা ঘটেছিল তখন মানুষ স্বাগত জানিয়েছিল শিল্প-কারখানার অর্থনৈতিক অবদানকে। ফলে শিল্পায়ন দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। আবার, বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের প্রসারণ ও শিল্পায়নের সম্প্রসারণ উভয়ে মিলে পরিবেশের দূষণ ঘটিয়ে এই সংকটকে ত্বরান্বিত করেছে। আমরা লক্ষ্য করছি প্রতিনিয়ত বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে যার ফলে প্রকৃতি আমাদের যে দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করতো তা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, জ্বালানিও দ্রুত হারে হ্রাস পাচ্ছে। অত্যধিক জনসংখ্যা ক্রমশঃ কৃষি অঞ্চলকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছে; তাছাড়া, মানুষের বাণিজ্যিক লোভ-লালসার মনোভাব মানুষকে ভোগবাদী করে তুলেছে, মানুষের পরিমিতি বোধ শূণ্যে গিয়ে ঠেকেছে। বিজ্ঞানের অতি উন্নত প্রযুক্তিগত জ্ঞান থেকেই আমরা প্রকৃতির এ নিজস্ব গতিধারাকে পরিবর্তিত করে আমাদের প্রয়োজন মতো প্রকৃতিকে চালিত করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আমাদের সীমাহীন চাহিদা, লোভ-লালসাপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা প্রকৃতির উপর অত্যাচার ও শোষণে পরিণত হয়েছে (খানম ৭)।

প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কটা আর বন্ধুত্বপূর্ণ সহনশীল পর্যায়ে নেই, তা এখন সংঘাতপূর্ণ ও দ্বন্দ্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ক্রমশই জীবমন্ডলের অবস্থা বিপদজনক হয়ে পড়ছে। জীবমন্ডল বিপদ-শঙ্কুল অবস্থায় থাকলে এর সকল জীবের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকবে। মানবজাতিও অস্তিত্বের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে রক্ষা পাবে না। এমন অবস্থায় পরিবেশ, প্রকৃতি তথা বাস্তুতন্ত্রকে নিয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলো আলোচনা গড়ে তুলেছে যাতে করে বাস্তুবিদ্যক উপলব্ধি ও সচেতনতা মানুষের মাঝে সাড়া জাগাতে পারে। নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর আগামীর জন্য, মানুষের উচিত তার আচরণ পরিবর্তন করা এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার সমস্ত ক্ষতিকর কার্যকলাপ ত্যাগ করা। তা না হলে ভবিষ্যতে বাঁচার মতো পৃথিবী থাকবে না। পরিবেশকে পরিষ্কার ও নিরাপদ রাখার স্বার্থে মানুষকে সচেতন করার জন্য অবিলম্বে কিছু করা উচিত। এখানে, শিক্ষা একটি মূল ধারণা কারণ শিক্ষার মাধ্যমে, আচরণগুলি পছন্দসই উপায়ে গঠন করা যেতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের প্রকৃতিপ্রেম প্রদান করা হলে ভবিষ্যতে মানুষ বনাম প্রকৃতির সম্পর্ক আরও ভালো হবে। পরিবেশগত নীতিবিদ্যা এই বিষয়ে প্রণীত প্রচেষ্টার নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে। পরিবেশগত নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্প্রীতি প্রদান করা হবে কারণ পরিবেশগত নৈতিকতার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির প্রকৃত মূল্য বুঝতে সক্ষম হবে। নৈতিকতা, নীতিবোধ, নৈতিক সচেতনতা - যে ভাবেই বলিনা কেন সবই মানুষের মাঝে প্রচ্ছন্নভাবে আছে। পারিপার্শ্বিক নানা চাপে নিষ্ক্রিয়ভাবে নির্জীব হয়ে পড়ে রয়েছে যে নৈতিক বোধ তাকে জাগ্রত করতে না পারলে ভোগসর্বস্ব জড়বাদী চেতনা মানব সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। নীতিবিদ্যা কোনো উপদেশ সর্বস্ব জ্ঞান নয় - এ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার উপায়। ধরিত্রীর বুকে টিকে থাকতে হলে বাস্তুতন্ত্রের সাথে আমাদের কার্যাদি পরিকল্পনাভিত্তিক হতে হবে এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর আমাদের কার্যাদির প্রভাবও সুনিয়ন্ত্রিত হতে হবে। কেবল মানব সমাজের স্বার্থের কথা চিন্তা করলে হবে না, চিন্তা করতে হবে বাস্তুতন্ত্রের অখন্ডতার কথা - বিভিন্ন সত্তার অখন্ডতার কথা যাদের মাঝে মানব সত্তাও রয়েছে (খানম ৮)। সেক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের প্রতিটি স্তরের সদস্যদের পরিবেশগত নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা প্রদান করতে হবে। মোট কথা, পরিবেশ সমস্যাকে বুঝতে হলে ও এর সমাধান পেতে হলে নৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ শিক্ষাকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না। পরিবেশগত শিক্ষা মূলত পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়, পরিবেশগত সমস্যা এবং এর সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতামূলক জ্ঞান প্রদান করে থাকে। দেরিতে হলেও, এটি বর্তমানে জ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে যেখানে ব্যক্তিরা পরিবেশগত সমস্যাগুলির উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পেতে এবং বিভিন্ন কোণ থেকে পরিবেশগত সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হচ্ছে। পরিবেশগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার অর্থ হল, মানুষের জীবনকে উন্নত করতে এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে সর্বস্তরের মানুষের বোঝাপড়ার মাত্রা বাড়ানোর একটি প্রচেষ্টা।

২. সমকালীন বৈশ্বিক পরিবেশগত সংকট

সমকালীন পরিবেশ সংকট মানুষের সামগ্রিক বিকাশের পথে এক অভূতপূর্ব অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করছে। আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে বিশ্বের সমস্ত মানুষ সমষ্টিগতভাবে পরিবেশ সংকটে জর্জরিত। পরিবেশ ভারসাম্যহীনতার ফলে প্রবল উষ্ণায়ন, অকাল বর্ষণ, খরা, দূষিত আবহাওয়া, জমির উর্বরতা হ্রাস পাওয়া, সমুদ্রপৃষ্টের মতো উচ্চতা বৃদ্ধিসহ করোনার মত জন্তু থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া জুনোটিক রোগ মানুষের জনজীবনকে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্থ করে চলেছে। যান্ত্রিক প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, শিল্প-কারখানার সংখ্যাধিক্য, জীবাশ্ম জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কয়েক দশক ধরেই পৃথিবীব্যাপী, বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে। এমনকি ক্রমাগত অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প-কারখানা, যানবাহন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি থেকে নির্গত বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস যেমন: কার্বন মনো-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন প্রভৃতি ওজন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। এসব গ্যাসের কারণে পৃথিবীর উষ্ণতাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার প্রভাবে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি করছে; যা মানুষের অস্তিত্বের জন্য বিরাট হুমকি। আবার নতুন শহর তৈরি ও শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস ও বৃক্ষনিধনও চলছে সমানতালে। পৃথিবীর ওপর এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ। বর্তমান পৃথিবী যেসব ভয়াবহতম বিষয় মোকাবিলা করছে, পরিবেশগত সংকট এর অন্যতম। আমরা এরই মধ্যে মানবসৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবের মধ্যেই বেঁচে আছি। চলতি শতাব্দীর শেষের দিকেই মানবিক ও প্রাকৃতিক বিশ্ব-উভয় ক্ষেত্রেই যে ভয়ানক প্রভাব পড়তে যাচ্ছে, তা এড়াতে এখন পর্যন্ত খুব কম ব্যবস্থাই নিতে পেরেছে বিশ্বব্যবস্থা। এ অবস্থায় যখন জলবায়ু তৎপরতা নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি দরকার, তার পরিবর্তে বিনাশ ও ঝুঁকি প্রত্যাখ্যান-দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে সব আলোচনা।

৩. শিক্ষার অর্থ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষা হল একটি ধারাবাহিক এবং জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা পেতে শিক্ষা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ কী (Etymological Meaning of Education) তা অনুধাবন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

সাধারণভাবে শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে এসেছে। যার আক্ষরিক অর্থ হল শাসন করা, নির্দেশ দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করা বা শাস্তি দান করা প্রভৃতি। আবার শিক্ষা শব্দটি 'শিক্ষ' ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ হল বিদ্যা গ্রহণ বা শেখা। শিক্ষা শব্দটির সমার্থক শব্দ 'বিদ্যা' শব্দটি অধিক জনপ্রিয়। এটি সংস্কৃত 'বিদ' ধাতুরূপ থেকে এসেছে। যার অর্থ হল জ্ঞান অর্জন করা বা জানা। অর্থাৎ কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত করা।

এছাড়া শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি Education শব্দটি চারটি ল্যাটিন শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, সেগুলি হল:

ক) Educere যার অর্থ হল: নির্দেশনা দেওয়া (to lead out) বা নিষ্কশন করা (to draw out)

খ) Educare যার অর্থ হল: পরিচর্যা বা প্রতিপালন করা (to nourish, to bring up)

গ) Educatum যার অর্থ হল: শিক্ষাদানের কাজ (act of teaching training)

ঘ) Educo যার অর্থ হল- বাইরে নিয়ে আসা (to lead out)

শিক্ষা হল শিশুর জীবনব্যাপী ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিশুর যাবতীয় বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের যেমন লক্ষ্য থাকে তেমনি শিক্ষারও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Education) পরিলক্ষিত হয়। আদিম যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য ও

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তা নির্ধারন করার চেষ্টা করা হয়েছে ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আদিম বা প্রাচীন যুগের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আদিম বা প্রাচীন যুগের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করা। অর্থাৎ জীবনের কয়েকটি মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবন সংগ্রামে টিকে থাকাই ছিল শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাছাড়া প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার লক্ষ্য পরিলক্ষিত হয়। যথা - প্রাচীন গ্রিসের (স্পার্টা) শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং রাষ্ট্রের অনুগত করে তোলা ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া বা মোক্ষ লাভ করা। আবার প্রাচীন রোমের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যবহারিক জীবনে সমৃদ্ধি লাভ করা। অর্থাৎ আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করাই হল শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মধ্যযুগের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মধ্যযুগের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ধর্মকেন্দ্রিকতা। অর্থাৎ মধ্যযুগের ধর্মীয় রীতি নীতি কঠোরভাবে পালন করাই ছিল শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই মধ্যযুগের শিক্ষা ছিল কঠোর নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ।

আধুনিক যুগের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নগরায়ন, আধুনিকীকরণ, বিশ্বায়ন ও নবজাগরণের ফলে প্রাচীন ধ্যান-ধারণাযুক্ত সমাজ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। ফলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাই আধুনিক যুগের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর বা শিশুর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের উপর গুরুত্ব দেওয়া। তাই আধুনিককালের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি, সমাজ তথা সমগ্র জাতির কল্যাণ ও সার্বিক বিকাশ সাধন করা।

৪. পরিবেশগত শিক্ষার উদ্দেশ্য

মানুষ কর্তৃক প্রকৃতির উপর নেতিবাচক প্রভাবের সত্যতা আজ সবাই জানে। তা সত্ত্বেও মানুষ প্রকৃতির মারাত্মক ক্ষতি করেই চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে মানুষের কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে বিলুপ্তির কারণ হচ্ছে। জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণে বর্ধিত প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও, এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি অব্যাহত রয়েছে। বাস্তুতন্ত্রের অবনতি বা বিলুপ্তির উচ্চ মূল্য দিতে হচ্ছে মানুষকে। কোনো না কোনোভাবে প্রায় সব সংস্কৃতিই তাদের সমাজের জন্য প্রকৃতি এবং এর জৈবিক বৈচিত্র্যের গুরুত্বকে স্বীকার করেছে এবং তাই জীব-বৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুধাবন করতে পেরেছে। তবুও, ক্ষমতা, লোভ এবং রাজনৈতিক স্বার্থের কাছে সবকিছু ধুলিস্যাৎ হতে চলেছে (Shah ২০১৪)। এই সমস্ত এবং অন্যান্য বৈশ্বিক পরিবেশগত সমস্যার পিছনে আসল কারণ হল মানবকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা।

দর্শনে, মানবকেন্দ্রিকতা বলতে যে দৃষ্টিকোণকে নির্দেশ করা হয় তা হলো- মানুষই একমাত্র, বা প্রাথমিক নৈতিক অবস্থানের ধারক। কাজেই মানবকেন্দ্রিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রকৃতিকে মানুষের মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখে (Rolston 66)। মানবকেন্দ্রিক মূল্যায়ন পদ্ধতির ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, সম্প্রদায়ের পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের জন্য সংগ্রামরত মানুষও রয়েছে।

অনেক সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মানুষ পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু তারা পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন না। প্রায়শই, প্রকৃতপক্ষে, তাদের প্রচেষ্টা পরিস্থিতিকে ভাল করার পরিবর্তে আরও খারাপ করে তোলে। এখানে কিছু প্রধান কারণ রয়েছে (Hughes 3-4):

• তারা এটি বুঝতে পারে না যে একটি সমস্যার ধরন এবং সমাধান নিয়ে তারা নিজেরা কীভাবে চিন্তা করছে এবং পাশাপাশি অন্যরা কী চিন্তা-ভাবনা করছে।

• তারা প্রকৃত সমস্যা, ইস্যু এবং চ্যালেঞ্জগুলি নির্ধারন করতে খুব কম সময় ব্যয় করে। সেক্ষেত্রে প্রকৃত সমস্যার সমাধানে ঐক্যমত্য পোষণে ব্যর্থ হলে তারা তখন সেটাকে ত্যাগ করে ভিন্ন সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে।

• তারা পূর্বকল্পিত সমাধান মাথায় রেখে আলোচনায় প্রবেশ করে। ফলে এক্ষেত্রে যেটি ঘটে তা হচ্ছে, কাজের সাফল্য পরিমাপ করা হয় তাদের মাথায় থাকা পূর্বকল্পিত সমাধান বাস্তবায়িত হয়েছে কি না তার ভিত্তিতে, প্রকৃত এবং অন্তর্নিহিত সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে কিনা তা দ্বারা নয়।

• তাদের মধ্যে সত্যিকারের খোলা মনের অভাব রয়েছে। তারা যেমনভাবে অন্যদেরকে সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করে থাকে তেমনিভাবে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুক্তিগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক।

• তারা কেবল সঠিক উত্তর খোঁজার উপর দৃষ্টি স্থির রাখে। তারা সমগ্র সমস্যাটিকে নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জে ভেঙ্গে এবং আলাদা আলাদা করে চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করার পরিবর্তে সকল সমস্যার সমাধান একবারে করার চেষ্টা করে।

• তারা স্বীকার করতে ব্যর্থ হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি যেমন- বুদ্ধি, আবেগ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হতে পারে এবং কোনো একক শক্তি অন্য কোনো শক্তিকে মূল্য বা গুরুত্বের দিক থেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

• তারা এমন কোনো একটি রোডম্যাপ অনুসরণ করেনা যা অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত উভয়েই অনুসরণ করতে এবং বুঝতে পারে। যখন অন্যরা উক্ত রোডম্যাপে কোনো স্পর্শকাতর সমস্যার সমাধান দেখে না, তখন তারা চূড়ান্ত সমাধানটিকে অবিশ্বাস করে।

পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য, প্রাথমিকভাবে জনগণকে পরিবেশ সুরক্ষা এবং উন্নতি সম্পর্কে শিক্ষিত করা উচিত। এটি পরিবেশগত শিক্ষা দ্বারা সাধন হতে পারে। পরিবেশগত শিক্ষা হল এমন একটি শিক্ষণ প্রক্রিয়া যা পরিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ও সচেতনতা বাড়ায়, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ ঘটায়, সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং দায়িত্বশীল পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মনোভাব, অনুপ্রেরণা এবং প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি করে। পরিবেশগত শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

• **সচেতনতা:** সামাজিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের পরিবেশ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলির প্রতি সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতা অর্জনে সহায়তা করা,

• **সংবেদনশীলতা:** সামাজিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এবং পরিবেশ ও এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলির প্রাথমিক ধারণা অর্জনে সহায়তা করা,

• **মনোভাব:** সামাজিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের পরিবেশের জন্য কিছু মূল্যবোধ এবং উদ্বেগের অনুভূতি এবং পরিবেশের উন্নতি এবং সুরক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা অর্জনে সহায়তা করা,

• **দক্ষতা:** সামাজিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের পরিবেশগত সমস্যা সনাক্তকরণ এবং সমাধানের জন্য দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা,

• **অংশগ্রহণ:** সামাজিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সমস্ত স্তরে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার সুযোগ প্রদান করা (Hungerford and Volk 8-9)।

মানুষকে পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এই সমস্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা জরুরী। এই উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল নাগরিককে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে এমন একজন হিসাবে যার সম্পূর্ণ পরিবেশ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলির প্রতি সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতা, পরিবেশ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলির একটি প্রাথমিক ধারণা, পরিবেশের জন্য উদ্বেগের অনুভূতি এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা রয়েছে। তাছাড়াও পরিবেশ উন্নতি এবং সুরক্ষা, পরিবেশগত সমস্যাগুলি সনাক্তকরণ এবং সমাধানের দক্ষতা, পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের দিকে কাজ করার জন্য সমস্ত স্তরে সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা যার রয়েছে (Hungerford and Volk 9)। ব্যাপকভাবে পরিবেশগত শিক্ষার লক্ষ্য হলো প্রয়োজনীয় পরিবেশগত জ্ঞানের বিকাশ, পছন্দসই পরিবেশগত মনোভাব তৈরি করা, উপযুক্ত পরিবেশগত মূল্যবোধকে উৎসাহিত করা এবং সর্বোপরি ব্যক্তি, সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি এবং বিশ্বের চারপাশের সবকিছুর সাথে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য সর্বজনভাবে স্বীকৃত আচরণের আদর্শ লালন করা (Rai and Sharma 35)। পরিবেশগত শিক্ষা মানুষকে তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করার সুযোগ দেয়। তারা পরিবেশের প্রতি আরও ভাল ধারণা এবং চিন্তাভাবনা অর্জন করতে পারে। তারা পৃথিবীর সমস্ত সদস্য সম্পর্কে বিশ্বজনীন, সামগ্রিক এবং নৈতিকভাবে চিন্তা করতে শুরু করে এবং নিজেদেরকে সমগ্রের অংশ হিসাবে দেখতে শুরু করে। 'প্রকৃতির সদস্য কিন্তু মালিক নয়'- এভাবে নিজেদেরকে ভাবতে শিখে। পরিবেশগত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার জন্য পরিবেশ নীতিবিদ্যা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫. পরিবেশ নীতিবিদ্যার অর্থ

যদি কেউ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দর্শনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করত, তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিকাশের মধ্যে একটি ছিল পরিবেশ নীতিবিদ্যার উত্থান। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পরিবেশ নীতিবিদ্যা অজানা ছিল। পরিবেশ নীতিবিদ্যা হলো দর্শনের এমন একটি শাখা যা পরিবেশের মূল্যের ধারণাগত ভিত্তির পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত ব্যবস্থা রক্ষা ও টিকিয়ে রাখার জন্য সামাজিক মনোভাব, কর্ম, এবং নীতির আশেপাশের আরও সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করে। পরিবেশগত নীতিবিদ্যা মানুষকে কীভাবে তাদের পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত, কীভাবে আমাদের পৃথিবীর সম্পদগুলি ব্যবহার করা উচিত এবং আমাদের কীভাবে অন্যান্য প্রজাতির (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) সাথে আচরণ করা উচিত, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। পরিবেশ নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রলসন বলেন, পরিবেশ নীতিবিদ্যা হলো প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত উদ্বেগ, মূল্যবোধ এবং কর্তব্য সম্পর্কে তত্ত্ব এবং অনুশীলন (Rolston 217)। প্রকৃতির সুরক্ষা নৈতিকভাবে সঠিক কিনা সাধারণ পরিভাষায় তার ন্যায্যতা প্রমাণ করাই কেবলমাত্র এর কাজ নয়। বরং পরিবেশ নীতিবিদ্যা এর সাথে প্রাসঙ্গিক সকল যুক্তিকে বিবেচনা করে এবং তাদের মূল্যায়ন করে, যাতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এর সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি বা পক্ষের জন্য সহজতর হয়। তার মানে, পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রকৃতি সংরক্ষণের সাথে প্রাসঙ্গিক যেসকল সিদ্ধান্ত এবং কাজ আছে সেগুলোকে মূল্যায়ন করে থাকে (Haider and Jax 2560)।

চিরায়ত সংজ্ঞা অনুসারে, নীতিবিদ্যা হলো ন্যায়বিচার এবং ভালবাসার মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষকে সম্পর্কযুক্ত করা। পরিবেশ নীতিবিদ্যার শুরুই হয় একটি মানসম্পন্ন পরিবেশের জন্য মানুষের উদ্বেগ দিয়ে এবং কেউ কেউ মনে করেন এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যরা মনে করেন যে, আন্তঃ-মানবীয় উদ্বেগের বাইরে, মানুষ যখন প্রাণী, উদ্ভিদ, প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত হয় তখন মূল্যবোধগুলি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, মানুষের উচিত প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে নৈতিকভাবে বিবেচনাযোগ্য হিসেবে মেনে নেয়া, এবং এটি নৈতিকতাকে নতুন দিকে নিয়ে যায় (Rolston 217)।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা পরিবেশের উপর যেমন নৈতিকতাকে প্রয়োগ করে, তেমনি ব্যবসা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, আইন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও নৈতিকতাকে প্রয়োগ করে থাকে। মানসম্পন্ন পরিবেশ মানসম্পন্ন জীবনের জন্যও প্রয়োজনীয়। মানুষ নাটকীয়ভাবে তাদের পরিবেশ পুনর্নির্মাণ করে; যেহেতু মানুষ যে বাস্তুতন্ত্র্যে বাস করে সেই বাস্তুতন্ত্র্যের মাটি, পানি, বায়ু, সালোকসংশ্লেষণ এবং জলবায়ু মানুষের জীবন ও মৃত্যুর সাথে জড়িত, সুতরাং নীতিবিদ্যাকে অবশ্যই পরিবেশের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।

৬. পরিবেশ নীতিবিদ্যার ধারণা

পরিবেশ নীতিবিদ্যা মূলত: প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে থাকে। যদিও ইতিহাস জুড়ে অসংখ্য দার্শনিক এই বিষয়ে লিখেছেন, তথাপি বলতে গেলে পরিবেশ নীতিবিদ্যা শুধুমাত্র ১৯৭০-এর দশকে একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক শৃঙ্খলায় বিকশিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই উত্থান ছিল প্রযুক্তি, শিল্প, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশের উপর যে প্রভাব ফেলছিল সে সম্পর্কে ১৯৬০-এর দশকে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার কারণে। এই সময়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের প্রকাশ এই ধরনের সচেতনতা বিকাশে সহায়তা করেছিল। র‍্যাচেল কারসনের *Silent Spring*, প্রথম প্রকাশিত ১৯৬২, পাঠকদের সতর্ক করেছিল যে কীভাবে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে এবং বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অনুরূপ তাৎপর্য ছিল পল এরলিচের ১৯৬৮ সালের বই, *The Population Bomb*, যা গ্রহের সম্পদের উপর সর্পিল মানব জনসংখ্যার বিধ্বংসী প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অবশ্যই, সেই সময় থেকে দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়ই একমাত্র পরিবেশগত উদ্বেগ ছিল না: উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীববৈচিত্র্য হ্রাস, বিজন প্রকৃতির ক্ষতিসাধন, বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন সব কিছুই উক্ত সমস্যাগুলির অংশ (Cochrane, 2006)। এই গুরুতর পরিবেশগত উদ্বেগগুলি প্রাকৃতিক বিশ্বকে নৈতিক চিন্তাভাবনার দিকে পরিচালিত করে এবং মানুষ প্রকৃতির প্রতি তাদের নিজস্ব আচরণগুলোকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে শুরু করলো। এখানে পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানুষকে পথ দেখিয়েছে।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা কর্মের মানদন্ড প্রণয়ন করে এবং পরিবেশের প্রতি যৌক্তিক আচরণ কোনটি তা নির্দেশ করে। তদ্ব্যতীত, এতে এমন অভিজ্ঞতা অন্তর্ভূক্ত করা উচিত যেখানে ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব নিয়ম এবং আদর্শিক বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পায় এবং এর ফলে তাদের নিজস্ব বিশ্বাস আদর্শিক বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। জ্ঞান, মনোভাব এবং ব্যক্তির নৈতিক অবস্থান এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলি একজন ব্যক্তির আচরণ নির্ধারণের জন্য একসাথে কাজ করে থাকে (Rai and Sharma 35)।

৭. পরিবেশ নীতিবিদ্যার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের যথার্থতা

পরিবেশ নীতিবিদ্যায় তিনটি ভিন্ন মূল্যের অবস্থান রয়েছে যা এর আলোচ্যসূচীকে তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করে:

মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Anthropocentrism - human centered): মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যা মনে করে যে পরিবেশ সম্পর্কিত আমাদের যত ধরনের দায়বদ্ধতা আছে তার সবকিছুই নি:সৃত হয় একমাত্র মানব স্বার্থ থেকে। এই মতাদর্শ অনুসারে (Passmore 41):

- একমাত্র মানুষেরই স্বত:মূল্য (নিজ গুণেই মূল্যবান) এবং নৈতিক মর্যাদা রয়েছে।
- মানুষ ব্যতীত প্রকৃতির অন্য সবছুির কেবল পরত:মূল্য রয়েছে (অর্থাৎ মানুষের ব্যবহারের সামগ্রী হিসেবে তারা মূল্যায়িত হবে)।

- মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানবস্বার্থকে সবকিছু বিচারের সর্বোচ্চ মানদন্ড বলে মনে করে।
- এই মতবাদ প্রকৃতির উপর মানুষকে বিজয়ী করার পক্ষে।
- প্রকৃতিকে অবাধে ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহারের অধিকার মানুষের থাকা উচিৎ বলে মনে করেন এই মতাদর্শীগণ।
- প্রকৃতি শক্তি এবং কাঁচামালের একটি মুক্ত এবং সীমাহীন উৎস ছাড়া আর কিছুই নয়, ফলশ্রুতিতে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকার প্রয়োজন নেই।
- মানব সভ্যতার অগ্রগতি নির্ভর করছে মানুষের কাছে প্রকৃতির আত্মসমর্পনের উপর।

তবে, মানবকেন্দ্রিক রক্ষণশীল ধারা (conservationists) অনুযায়ী আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং আমাদের তা বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ এমনভাবে ব্যবহার করা উচিৎ যাতে পরিবেশ টেকসই হয়। আবার মানবকেন্দ্রিক সংরক্ষণবাদীরা (preservationists) যুক্তি দেখান যে প্রকৃতির কিছু অংশ, বিশেষ করে বুনো অরণ্যের জন্য মানুষের ন্যূনতম অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করা উচিত এবং বন্য-প্রাণীর অভয়ারণ্য হিসাবে এটির ব্যবহার সীমিত হওয়া উচিৎ।

জীবনকেন্দ্রিকতাবাদ (Biocentrism - life centered): জীবনকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে যেকোনো জীবন নিজেই আমাদের নৈতিক সম্মানের কেন্দ্রিয় বস্তু হওয়া উচিত। তাঁরা মনে করেন সব ধরনের জীবনেরই বেঁচে থাকার সহজাত অধিকার রয়েছে। জীবনকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে প্রাণির এক বিশেষ প্রজাতি ছাড়া আর কিছু হিসেবে বিবেচনা করে না। তাঁরা আরও মনে করেন উদ্ভিদসহ সকল জীবিত সত্তার নিজস্ব সহজাত মূল্য এবং জীবিকার অধিকার রয়েছে, কাজেই সকল সত্তারই সমান সম্মান পাওয়া উচিৎ (Callicott 38)। পল টেইলরের মতে (Taylor 37):

১. মানুষ জৈবিক সম্প্রদায়ের নিছক সদস্য, বিশেষ সদস্য নয়। আমরা প্রাণী বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফসল। এটি আমাদের অস্তিত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রাণী হিসেবে আমরা বেঁচে থাকার জন্য সম্পূর্ণভাবে পরিবেশগত ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রে এমনটাও ধারণা করা হয় যে মানবসভ্যতার বিনাশ বরং পরিবেশের জন্য উপকারী।

২. সমস্ত বাস্তুতন্ত্র এমন একটি জাল দ্বারা সৃষ্ট যেখানে সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ও আন্তঃনির্ভরশীল। সকল জীবন্ত বিষয়ের অস্তিত্ব অব্যাহত রাখতে দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত ভারসাম্য প্রয়োজন। বাস্তুতন্ত্রের এই সামগ্রিক প্রকৃতি কোনো নৈতিক নিয়ম এর আওতাধীন নয়।

৩. প্রতিটি জীবন্ত বিষয়কে জীবনের একটি উদ্দেশ্যমূলক কেন্দ্র হিসেবে কল্পনা করা হয়। প্রত্যেকের নিজস্ব লক্ষ্য ও নিজস্ব জৈবিক কাজ রয়েছে। আমারা যখন অন্যান্য জীবিত বিষয়কে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তখন দেখতে পাই যে তাঁদের জীবনের এক উদ্দেশ্যমূলক কেন্দ্র আছে। তারা লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে।

৪. মানুষ কোনোভাবেই অন্য জীবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। অন্যান্য জীবের প্রতি মানব অহংকার দূর করতে হবে। এটা কখনোই ধারণা করা উচিত নয় যে মানুষের বিশেষ গুণাবলী অন্যান্য প্রাণীর বিশেষ গুণাবলী থেকে উচ্চতর। এ ধরণের মনোভাব শ্রেণীবৈষম্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমরা মৌলিকভাবে আলাদা ও উচ্চতর।
টেইলর মনে করেন, জৈবকেন্দ্রিক এমন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার ফলে আমরা প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গ্রহণ করি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এখানে পৃথক জীবন্ত বিষয়কে দায় দেওয়া হচ্ছে। মূলত টেইলরের মত থেকে বলা

যায় যে, মানুষের মতো অন্যান্য প্রাণেরও অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। পরিবেশের এ সকল প্রাণের প্রতি তথা জৈবিক সম্প্রদায়ের প্রতি সমআচরণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা তথা বিপর্যয় রোধ করা যায়।

বাস্তুতান্ত্রিকতাবাদ (Ecocntrism – ecosystem centered): বাস্তুকেন্দ্রিক চিন্তাবিদগণ জীবনকেন্দ্রিক ভাবনাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান এবং দাবি করেন যে বাস্তুতন্ত্র এবং এর সমস্ত উপাদান, যার মধ্যে অ-জীব এবং অজৈব অংশগুলি রয়েছে- সবকিছুই পরিবেশ নীতিবিদ্যার উদ্বেগের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ কেবলমাত্র জৈবিক সত্তা নয় বরং বায়ু, পানি, মাটি, পাথর, প্রাকৃতিক ভূমিসহ সমগ্র প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত মূল্য এবং অধিকার রয়েছে।

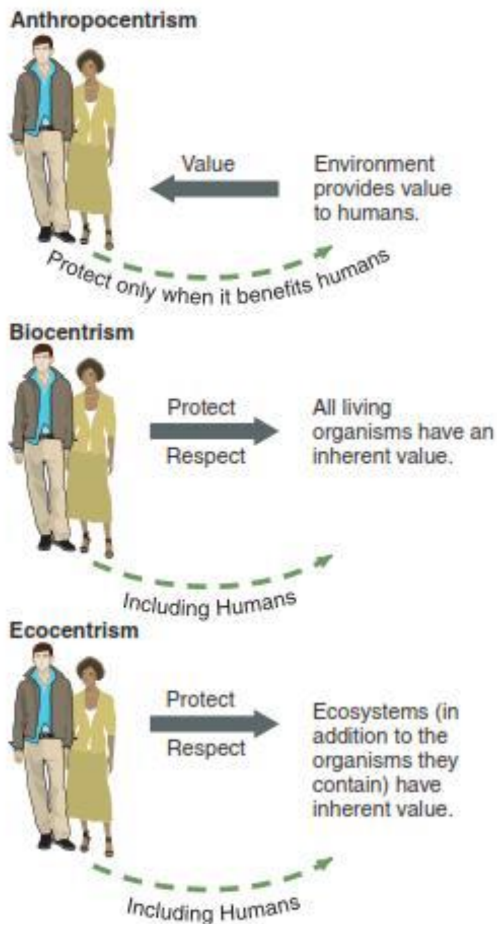

চিত্র: পরিবেশ নীতিবিদ্যার তিনটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ড যথার্থই বলেছেন: "কোনো একটি বিষয় সঠিক যদি সেটি জৈবিক সম্প্রদায়ের অখন্ডতা, স্থায়িত্ব এবং সৌন্দর্যকে রক্ষা করে। এটা ব্যতীত অন্য কোনো প্রবনতা ভুল....আমরা ভূমিকে জয় করতে চাই, দখল করতে চাই কেননা আমরা এটিকে আমাদের অধীনস্থ পণ্য (commodity) বলে মনে করি। যখন আমরা ভূমিকে

পণ্য না মনে করে আমাদের সম্প্রদায়ের (community) অংশ বলে মনে করব, তখন থেকেই আমরা এটিকে ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে ব্যবহার করতে পারবো" (Leopold 157)।

মোটকথা বাস্তুতান্ত্রিকতাবাদ অনুসারে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে ভূমির সকল উপাদানের প্রতি সমদৃষ্টি প্রয়োজন।

মানুষের উচিত পরিবেশগত সমস্যার মূল কারণগুলি চিহ্নিতকরণ এবং সমাধান করা। আর এটা করার জন্য সমাজের কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানগুলির একটি মৌলিক রূপান্তর প্রয়োজন হবে। মানুষ প্রকৃতির বাকি অংশ থেকে আলাদা নয়, তারা এটির অংশ কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে তারা এটিকে নিজের বলে অনুভব করে না, তাই তাদের একটি পরিবেশবান্ধব জীবনধারা গ্রহণ করা উচিত। মানুষের মন পরিবর্তন করা উচিত এবং প্রকৃতির প্রতি তাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত। পরিবেশগত নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে এটি অর্জন করা যেতে পারে (Naess 93)।

৮. সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য পরিবেশ নীতিবিদ্যা শিক্ষার গুরুত্ব

নৈতিকতা মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত। পরিবেশ নীতিবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত "নীতি ও মূল্যবোধ যা একজন ব্যক্তি হিসাবে এবং সমাজের একজন সদস্য হিসাবে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য অনুসরণ করা উচিত"। এইভাবে, মানুষের আচরণের সাথে নীতিবিদ্যা সরাসরি সম্পর্কিত হয় একজন ব্যক্তির দ্বারা বিকশিত মূল্য ব্যবস্থার মাধ্যমে। যাইহোক পরিবেশগত মূল্যবোধ যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা হলো- পরিবেশগতভাবে ভাল কী? আর পরিবেশগতভাবে খারাপ কী? অন্যদিকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা যেসব বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চায় তা হলো- তাই করা যা ভাল এবং যা খারাপ তা না করা। পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানুষের এবং পরিবেশের মধ্যে নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে। সুতরাং, পরিবেশ নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির কীভাবে আচরণ করা উচিত বা পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সময় কী নিয়ম ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত তা ব্যাখ্যা করা। এই নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলি সিদ্ধান্ত, পছন্দ এবং কাজ করার জন্য বিভিন্ন মানদন্ড নির্ধারন করতে সাহায্য করে। এই মূল্যবোধগুলি শুধুমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। ফলে সঠিক ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে যাতে করে সমাজের প্রতিটি সদস্য সামাজিকভাবে এবং পরিবেশগতভাবে দায়বদ্ধ এবং পরিবেশকেন্দ্রিক আচরণের জন্য সক্ষম হয়ে ওঠে। এটি পরিবেশগত শিক্ষার সামগ্রিক কাঠামোতে মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার অন্তর্ভুক্তির দাবি করে। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের আচরণকে পরিবেশবান্ধব করার দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পরিবেশ নীতিবিদ্যার দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর । সুতরাং, পরিবেশ নীতিবিদ্যা এবং কোর্সের পাঠ্যক্রমে এর অন্তর্ভুক্তির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী নৈতিক মূল্যবোধ বোঝার এবং আত্মস্থ করার সুযোগ পেতে পারে (Klimmerer 337)।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, জনসচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ সহ শিক্ষাকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে পরিচালিত করা উচিত যার মাধ্যমে মানুষ এবং সমাজ তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে। টেকসই উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশগত এবং নৈতিক সচেতনতা, মূল্যবোধ এবং মনোভাব, দক্ষতা এবং আচরণ অর্জন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় শিক্ষাই জনগণের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য অপরিহার্য এই জন্যে যে যাতে তারা টেকসই উন্নয়নকে মূল্যায়ন ও সমাধান করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে (UNESCO, 2002)।

সমাজ ও দেশের উন্নয়নে শিক্ষা একটি মৌলিক বিষয়। শিক্ষিত মানুষ সচেতন মানুষ। বিশেষ করে পরিবেশ সচেতনতার জন্য সমাজের মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে। পরিবেশগত নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে সম্প্রদায়ের সদস্যরা এই চেতনা অর্জন করতে পারে। Linnanvuori; 131-157) এর মতে; বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য মূল্যবোধের একটি বড় পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিবেশগত শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত, বিশ্বদর্শন, নীতিবিদ্যা এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সরকার, ব্যবসা এবং ব্যক্তিদের দ্বারা গৃহীত পরিবেশগত সিদ্ধান্তকে কখনই নৈতিকতা থেকে আলাদা করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। আমরা আজ নীতিগত স্তরে, শক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের স্বতন্ত্র ভোক্তা হিসাবে যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তা সমগ্র মানবজাতিকে তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উপর চাপ বাড়ার সাথে সাথে নারী, পুরুষ, যুবক এবং বৃদ্ধ সবাই বুঝতে পারছে যে পরিবেশগত সমস্যাগুলি প্রত্যেকের জন্য সমপরিমাণ উদ্বিগ্নতা তৈরি করছে এবং শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত উপায়ে তাদের সমাধান করা যাবে না। তারা বুঝতে পারে যে পরিবেশ ব্যবস্থাপনাও নীতিশাস্ত্রের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল (UNEP, 2006)। তাই পরিবেশগত নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে সম্প্রদায়ের সদস্যদের সচেতনতা প্রদান করলে পরিবেশগত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞান ও নৈতিকতা দুটিকে পৃথক করে না দেখে এ দুটির সমন্বয় পরিবেশ সমস্যা তথা পরিবেশ বিপর্যয়কে রোধ করতে সার্থক ভূমিকা রাখতে পারে। বিজ্ঞানী ও দার্শনিক উভয়ের কর্তব্য হচ্ছে পরিবেশ সমস্যাগুলোর বাস্তবমুখী, সংস্কারমুক্ত বিশ্লেষণ করা এবং এ সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণগুলো দূর করার পথ অনুসন্ধান করা। বিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে আমরা জগতকে দেখতে শিখেছি, বিচার করতে শিখেছি। বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের চারিপার্শ্বের জগতের বিষয়গুলোকে মূল্যায়নের দিকেও প্রভাবিত করেছে। বিজ্ঞান আমাদের যেন কেবল বাস্তববাদী অথবা জড়বাদী করে না রাখে সে জন্যে মূল্যবোধ অথবা কর্তব্যবোধকে জাগ্রত রাখতে হবে। বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাথে নৈতিক চেতনা সম্পর্কিত সামগ্রিক জ্ঞানই হলো যথার্থ জ্ঞান। জারডিন্স তাই যথার্থই বলেন যে, "নৈতিকতা ব্যতীত বিজ্ঞান হলো অন্ধ আর বিজ্ঞান ব্যতীত নৈতিকতা হলো শূণ্য" ("Science without ethics is blind and ethics without science is empty") (Jardins 11)।

নৈতিকতা, নীতিবোধ, নৈতিক সচেতনতা - যে ভাবেই বলিনা কেন সবই মানুষের মাঝে প্রচ্ছন্নভাবে আছে। পারিপার্শ্বিক নানা চাপে নিষ্ক্রিয়ভাবে নির্জীব হয়ে পড়ে রয়েছে যে নৈতিক বোধ তাকে জাগ্রত করতে না পারলে ভোগসর্বস্ব জড়বাদী চেতনা মানব সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। নীতিবিদ্যা কোন উপদেশ সর্বস্ব জ্ঞান নয় - এ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার উপায়। ধরিত্রীর বুকে টিকে থাকতে হলে বাস্তুতন্ত্রের সাথে আমাদের কার্যাদি পরিকল্পনাভিত্তিক হতে হবে এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর আমাদের কার্যাদির প্রভাবও সুনিয়ন্ত্রিত হতে হবে। কেবল মানব সমাজের স্বার্থের কথা চিন্তা করলে হবে না, চিন্তা করতে হবে বাস্তুতন্ত্রের অখন্ডতার কথা - বিভিন্ন সত্তার অখন্ডতার কথা যাদের মাঝে মানব সত্তাও রয়েছে।

অখন্ডতা রক্ষা করার চেতনা একটি নৈতিক চেতনা। নীতিবিদ্যা আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আমাদের মাঝে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উপলব্ধি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মানব সমাজের অস্তিত্ব প্রকৃতির উপরও নির্ভরশীল। মানব সমাজ বহু জাতির, বহু বর্ণের মানুষের সমন্বিত সমাজ, অন্যদিকে বহু সত্তার সমন্বিত অংশও এই মানব সমাজ। এই বহুত্বের সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্যেই নৈতিক উপলব্ধির প্রয়োজন। কাজেই শুধু মানুষ নয় পরিবেশের প্রতিও আমাদের দায়-দায়িত্ব রয়েছে যা স্বীকার করতে হবে। এ দায়-দায়িত্ব নৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ হতে হবে। আমাদের আচার-আচরণে পরিবেশের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পেতে হবে। পরিবেশগত

সমস্যা আমরা কেবল বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে মোকাবেলা করতে পারব না, সমন্বিতভাবে আমাদের তা করতে হবে। দার্শনিক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের থাকতে হবে। বর্তমান পরিবেশ সঙ্কট নিষ্পত্তি করতে হলে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাঝেও নৈতিকতাকে সমানভাবে স্থান দিতে হবে। তাই পরিবেশ সঙ্কট মোকাবেলায় দার্শনিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনাকে গুরুত্বের সাথে অধ্যায়ন করতে হবে। পরিবেশ সমস্যাকে বুঝতে হলে ও এর সমাধান পেতে হলে নৈতিক চেতনাকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না।

৯. কোন ধরনের পরিবেশ নীতিবিদ্যা শিক্ষা বৈশ্বিক পরিবেশগত সংকট উত্তরণে যথার্থ এবং কেন

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় পরিবেশগত বিপর্যয়গুলো মানব কার্যকলাপ ও প্রাকৃতিক শক্তির জটিল ক্রিয়ার ফলাফল। মানব কার্যাবলীর মধ্যে বন উজাড়, দূষণ, প্রাণী ধ্বংসের মতো কার্যাবলী প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা যেমন বাড়িয়ে তুলছে তেমনি প্রাকৃতিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন, আবহাওয়ার চরম মাত্রা পরিবেশের জন্য ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। তবে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণগুলো একটি আরেকটির সাথে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। ফলে যেকোনো ধরণের বিপর্যয়ের সাথে মানুষের সংযুক্ততা রয়েছে কারণ মানুষই পরিবেশ বিপর্যয়ের মাধ্যম তৈরি করে।

কিন্তু এভাবে পরিবেশ বিপর্যয় ও পরিবেশের অবনতি পরিবেশের মোকাবেলা করা মানব সমাজের জন্য বড়ই চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিবেশকেন্দ্রিক মতবাদগুলোর গুরুত্ব অনেক। কিন্তু এ মতবাদগুলোর নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও পরিবেশের বিপর্যয় রোধকল্পে অধিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসেবে ভূমি নীতিবিদ্যাকে বেছে নেয়া যেতে পারে। ভূমি নীতিবিদ্যার সীমাবদ্ধতা থাকলেও এ মতবাদটি অন্য মতবাদগুলো থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ অন্য মতবাদগুলো প্রকৃতির জৈব সম্প্রদায়কে নৈতিক মূল্যে বিচার করে কিংবা মানবকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে।

ভূমি নীতিবিদ্যা মানুষ, জৈব সমাজ, অজৈব সমাজ সকল কিছুর আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রকে কেন্দ্রে রাখে। সকল কিছুই বাস্তুতন্ত্রের সদস্য। পুরো বাস্তুতন্ত্র এক ধরণের সম্প্রদায়ের মত। যেহেতু সকল কিছুই এই সম্প্রদায়ের সদস্য ফলে সকল সদস্য পরস্পর শ্রদ্ধা ও সম্মান বজায় রাখবে (Leopold 201.)। তাছাড়া যেহেতু সবাই একই সম্প্রদায়ের সদস্য ফলে এ মতাবাদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য দিক হলো এখানে মানুষ, অমানবপ্রাণী ও উদ্ভিদসহ সকল জৈব ও অজৈব বিষয়ের জন্য প্রসারিত হয় (Callicott 41)।

ফলে এখানে যেমন মানব প্রাণী ও অমানবপ্রাণীর প্রতি অসচেতনতা নিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় তেমনি গাছপালা, ভূমি, পানিসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও সচেতনতার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এমন দৃষ্টিভঙ্গি অন্য মতগুলোতে পরিলক্ষিত হয় না। যার কারণে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ বা কমানোর ক্ষেত্রে ভূমি নীতিবিদ্যা অন্যান্য মতবাদগুলোর চেয়ে এগিয়ে থাকে। এখানে ভূমি নীতিবিদ্যাকে গ্রহণ করার কয়েকটি যুক্তি হলো:

প্রথমত, এ মতবাদ পরিবেশের প্রতি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে। এর ফলে স্বীকার করা হয় পরিবেশের সকল উপাদান আন্তঃসম্পর্কযুক্ত তাই আমাদেরকে ভূমির ও তার সদস্যের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। **দ্বিতীয়ত**, ভূমি নীতিবিদ্যা প্রকৃতির মূল্য সম্পর্কে আমাদের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে। এ নীতি শোষণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি প্রচার করে। এটি বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধারকে অগ্রাধিকার দেয়। ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ে এটি অবদান রাখে। ক্যালিকটের মতে, ভূমিনীতি পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি নতুন ধারণাগত ভিত্তি প্রদান করে, যা প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণকে সর্বাগ্রে রাখে (Callicott 116)।

তাছাড়া এ নীতি পরিবেশগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আরো ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায্য পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে। মানব ও অমানব প্রাণীর আন্তঃসম্পর্কের স্বীকৃতি দিয়ে সহযোগিতামূলক পদ্ধতির প্রচার করে। এ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তসমূহ

ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায্য করতে স্থানীয় সম্প্রদায়, আদিবাসী, ভবিষ্যৎ প্রজন্মসহ সকল সদস্যের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা হয়। কিমারের মতে, পরিবেশগত ন্যায়বিচার অর্জনের জন্য আমাদের অবশ্যই ভূমি এবং এর সমস্ত সদস্যের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে (Kimmerer 337)। সর্বোপরি, ভূমি নীতিবিদ্যা পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে এবং প্রকৃতির একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে। পাশাপাশি বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় আরো ন্যায়সংগত পদ্ধতিতে উৎসাহ দিয়ে পরিবেশগত বিপর্যয় প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে।

১০. উপসংহারঃ

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক ব্যবহারের কারণে ওজোন স্তরের হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির মতো বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তা সত্ত্বেও মানুষ কেবলই ধ্বংস করে চলেছে। তবে প্রকৃতির বহন ক্ষমতা সীমিত। প্রকৃতির প্রতি মানুষের অসচেতন আচরণের কারণে, আমাদের পুরানো পৃথিবী এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবন বড় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। মানুষের অবিলম্বে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি জীবনধারা অনুসরণ করা উচিত। অন্যথায়, ভবিষ্যত প্রজন্ম এতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই ক্ষেত্রে, পরিবেশগত নৈতিকতা শিক্ষা সম্প্রদায়ের সদস্যদের পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। পরিবেশগত নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করার ফলে তাদের মধ্যে পরিবেশ বান্ধব আচরণ পরিলক্ষিত হবে কারণ তখন তাদের প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে।

পরিবেশগত নৈতিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসার বিজ্ঞান ও দর্শন উভয় দিক থেকে হতে হবে। সমাজে অস্তিত্বশীল মূল্যবোধগুলোর প্রতি বিজ্ঞানী সমাজ উদাসীন থাকতে পারে না। অন্যদিকে, দার্শনিকগণও বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানকে উপেক্ষা করতে পারেন না। কোন গবেষণালব্ধ জ্ঞানের প্রায়োগিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় দায়িত্বশীল নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ হলেও নৈতিকতাকে উপেক্ষা করতে পারে না। পরিবেশ বিপর্যয়ের সামগ্রিক গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে হবে আমাদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ আমাদের পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণসমূহ অবগত করবে এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণ এই কারণসমূহ যাতে সৃষ্টি না হয় সেব্যাপারে আমাদের ঔচিত্যবোধকে জাগ্রত করবে। মানবজাতিকে সুস্থাবস্থায় বসবাস করতে হলে বাস্তুতন্ত্রের প্রতি আমাদের যত্নশীল হতে হবে। এ সম্পর্কিত নতুন চিন্তা-ভাবনা নিরেট বস্তুনিষ্ঠ হলে হবে না, আবার শুধু নৈতিক চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ হলেও হবে না। এর জন্যে প্রয়োজন আমাদের জীবনধারার পূর্ণর্বিন্যাস ও পূর্ণর্গঠন। এটা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও পরিবেশ বিপর্যয় থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে হলে বিজ্ঞানের জ্ঞানের ব্যবহার ও প্রয়োগ বহুলাংশে নির্ভর করবে এর নৈতিক বিবেচনার উপর। অন্যদিকে, নৈতিক মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে প্রগতির ধারাকে রোধ করা যাবে না। মানবজাতির অগ্রগতি প্রগতি ও বিকাশের ধারাকে আমরা উন্মুক্ত রাখতে চাই। প্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে আমরা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে যেমন উপেক্ষা করতে পারি না, তেমনি এই জ্ঞানের প্রায়োগিক দিকের নৈতিকতা সম্বন্ধেও উদাসীন থাকতে পারি না। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতার অপরিহার্য বাস্তবতা হচ্ছে বিজ্ঞান ও নৈতিক চিন্তার সমন্বয়মূলক জ্ঞান যা বর্তমান পরিবশেগত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম।

তথ্যসূত্র

Callicott, J. B. *Animal Liberation. A Triangular Affair*, in Donald Sherer & Thomas Attig (ed.), Prentice Hall, New Jersey, U.S. 1980.

Callicott, J. Baird, *In Defense of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy*, State University of New York Press, 1989.

Cochrane, A. "Environmental Ethics", Retrieved 15 September, 2023 from URI:http://eprints.lse.ac.uk /id /eprint/21190 2006.

Haider, S. & Jax, K. "The Application of Environmental Ethics in Biological Conservation: A Case Study from the Southernmost Tip of the Americas." *Biodivers Conserv, volum:16*, DOI 10.1007/s10531-006-9088-8 2007.

Hungerford, H. R. & Volk, T. R. "Changing Learner Behavior through Environmental Education", *The Journal of Environmental Education, Volume 21, Issue 3*. https://doi.org/10.1080 /00958964.1990. 10753743 1990.

Hughes, J. W. *Environmental Problem Solving: A How-to Guide*, University of Vermont Press 2007.

Jardins, J. R. D. *Environmental Ethics*, 2001.

Kimmerer, R. W. *Braiding Sweetgrass: Indegenous Wisdom, Scientific knowledge and the Teachings of Plants*, Milkweed Editions, 2013.

Leopold, A., *A Sand County Almanac and Sketches Here and There*, Edited by Charles W. Schwartz, Oxford University Press, Oxford 2020.

Linnanvuori, E. A. "Environmental Issues in Finnish School Textbooks on Religious Education and Ethics". *Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education. Volume: 1*. 2013.

Naess, A. *The Ecology of Wisdom*, Writings by Arne Naess, Edited by Alan Drengson and Bill Devall, Foreword by Wes Jackson. Counterpoint 2010.

Padwe, J. "Anthropocentrism", Retrieved 26 August, 2021 from http://www.oxfordbibliographies. com/view/document/obo-9780199830060/obo-9780199830060-0073.xml 2021.

Passmore, Arthur, *Man's Responsibility for Nature*, Duckworth, 1974.

Rai, A. K. & Sharma, R. N. *Environmental Ethics Education: A Necessity to Initiate Environment Oriented Action.* SPIJE, Vol 7, No. I, January. pp. 33-37, 2011.

Rolston, H. *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World*, Temple University Press 1988.

Shah, A. "Environmental Issues", Retrieved 19 January, 2014 from http://www.globalissues. Org/article/ 171/loss-of-biodiversity-and-extinctions 2014.

Taylor, p., *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, Princeton University Press 1986.

UNEP-United Nations Environment Program. (2006). Environmental Education, Ethics & Action: A Workbook to Get Started. Retrieved 29 June, 2014 from

http://www.unep.org/training/downloads/PDFs/ethics_en.pdf.

UNESCO-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2002). Education for Sustainability from Rio to Johannesburg: Lessons Learnt From a Decade of Commitment. World Summit on Sustainable Development, 26 August – 4 September. Johannesburg, South Africa 2002.

খানম, রাশিদা আখতার, *পরিবেশ নীতিবিদ্যা (২য় মুদ্রণ)*, মৌমিতা প্রিন্টার্স, ২০১৬।